পিআরএসপি

টেকসই দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনের কৌশলপত্র

আনু মুহাম্মদ

বিশ্বব্যাংক- আইএমএফ-এর যন্তরমন্তর ঘর থেকে সর্বশেষ যে মন্ত্রটি বিশ্বে সোরগোল তুলেছে সেটির নাম পিআরএসপি। এটি সকল 'দরিদ্র' দেশের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'দারিদ্র্য নিরসনে' অর্থাৎ এই দলিলে বর্ণিত কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকার ঘোষণা না করলে এসব দেশের সরকারকে কোনো সহযোগিতা দেয়া হবে না! এই মন্ত্রের পুরো নাম: পভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার বা দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র। যেসব কাজ এই দলিল নির্দেশ করছে, তাতে এর সঠিক নাম হতে পারে পভার্টি রিপ্রডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার অর্থাৎ দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন কৌশলপত্র। কেন এই ভিন্ন নাম প্রস্তাব? তার ব্যাখ্যাই আমি নিচে দেবার চেষ্টা করবো।

পিআরএসপি : চিনিতে মোড়ানো নতুন স্যাপ

গত এপ্রিল মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে বাংলাদেশের ইন্টারিম পভার্টি রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি পেপার (আইপিআরএসপি) প্রকাশিত হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে : 'এ ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ইকনমিক গ্রোথ এ্যান্ড পভার্টি রিডাকশন'। 'ন্যাশনাল' শব্দটি এখানে থাকতেই হবে। কারণ আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের কড়া হুকুম এই দলিল অবশ্যই দেশীয় সম্পদ হবে। একই কাঠামো, একই সুর, একই তাল বিশ্বের সকল দলিলে। কারণ এতে কি থাকবে, থাকতে হবে তা একদিকে যেমন বিশ্বব্যাংকীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন দেশের 'জাতীয়' অনুজ 'বিশেষজ্ঞ'দের 'বহু' কষ্টের চিন্তাভাবনার ফলাফল, অন্যদিকে তেমনি এগুলোর উপর আছে অব্যাহত তদারকি। বাংলাদেশে এই দলিল 'অংশগ্রহণভিত্তিক' করবার জন্য বৃহত্তম এনজিও-বাণিজ্যিক গ্রুপ ব্র্যাক কাজ করেছে। বিভিন্ন 'কনসালটেশন' প্রক্রিয়ায় এটি চূড়ান্ত করা হবে ২০০৪ সালের মার্চ মাসে। 'পার্টিসিপেশন' আর 'কনসালটেশন' এখন একটি বাধ্যতামূলক 'এক্সারসাইজ'। সেজন্য সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা কিংবা এনজিও-র এখন সেট করা 'জনগণ', 'প্রোগ্রাম', বাজেট তৈরি থাকে। ঢাকায় অনেক ব্যয়বহুল 'কনফারেন্স সেন্টার' এগুলোকে লক্ষ্য করেই গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের এই দলিলে যা যা আছে, এতে বাংলাদেশের 'উন্নয়নের' অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে যেসব কথাবার্তা আছে, সরকারের যেসব করণীয় কিছু স্পষ্ট কিছু প্রচ্ছন্নভাবে নির্দেশ করা আছে, সেগুলো বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি-ইউএসএইড-মার্কিন দূতাবাস-তেল কোম্পানি এবং তাদের সহযোগী 'জাতীয়' অনুজ 'বিশেষজ্ঞ' দের লেখা-বলাতে, মন্ত্রীবাহাদুরদের বাণীতে খুবই সুলভ। সেইসব কাজ করে করেই আজ বাংলাদেশ লুম্পেন-ডাকাতদের করতলগত। সেসব কাজ করে করেই বাংলাদেশে উৎপাদনশীল খাত পর্যুদস্ত, বেঁচে থাকার জীবন-জীবিকা-পরিবেশ বিধ্বস্ত, অফুরন্ত সম্ভাবনার ক্রমাগত বিনষ্টিতে মানুষ দিশেহারা। দারিদ্র্য হ্রাসের দলিল না বলে তাই একে অন্য যেকোন শিরোনামে উল্লেখ করা যায়, যেমন : 'বাংলাদেশের বিদ্যমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার কৌশল' কিংবা 'বাংলাদেশে বিদ্যমান ধারার বিদেশী বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার কৌশল' কিংবা 'বাংলাদেশে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে নয়া কৌশল' কিংবা 'বাংলাদেশে বিরাষ্ট্রীয়করণ ও সংস্কার কৌশল' কিংবা 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার কৌশল' কিংবা 'বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ-লুটেরা মালিক-আমলা-রাজনীতিবিদ-বিশেষজ্ঞদের আধিপত্য অব্যাহত রাখবার কৌশল'। এই নামগুলোই দলিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বলা যায়, এই প্রকৃত পরিচয় আড়াল করবার জন্যই একটা বিপরীত নাম দিয়ে দলিল হাজির করবার সাড়ম্বর ব্যয়বহুল চরম প্রতারণামূলক আয়োজন চলছে বাংলাদেশে এবং তুলনীয় আরও অন্যান্য দেশে। বিভিন্ন দেশ প্রতারণার এই অভিন্নরূপ এবং অভিজ্ঞতার পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে অভিন্ন চিন্তা, অভিন্ন স্বার্থ এবং অভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

খুব নিরীহ ঢঙে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কমসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে যে নির্দেশাবলী হাজির করেছে তার বাস্তবায়নই এই বৈশ্বিক ঐক্য বা যোগসূত্র রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংক তার ওয়েবসাইটে স্থাপিত এই সংক্রান্ত দলিলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর উদ্দেশে বলছে :

১. সাফল্যলাভের জন্য দেশের

মালিকানাধীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে অবশ্যই উন্নয়ন অংশীদারদের সমর্থন পেতে হবে এবং তাদের সহায়তা পাবার জন্য একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে আসতে হবে।

২. সকল দাতা এবং বহুমুখী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এই দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচির ডিজাইন নির্ধারণে অবদান রাখবে, তাদের নিজ নিজ অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট করবে, তার সমর্থনে নিজেদের অঙ্গীকার ঘোষণা করবে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ দেশের কর্তৃপক্ষকে সকল উন্নয়ন অংশীদারকে এর মধ্যে প্রথম থেকেই পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত রাখতে উৎসাহিত করবে।

৩. এই দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে সামনে রেখে দাতারা তাদের সাহায্য অঙ্গীকার ঠিক করবে এবং দেশের নিজস্ব কৌশল অনুযায়ী সরকার ও সিভিল সোসাইটিকে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ যোগান দেবে। এর ফলে বিভিন্ন শর্তের পুনরাবৃত্তি রোধ ও সমন্বয় এবং জাতীয় সীমিত প্রশাসনিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হবে।

৪. সবশেষে, সকল দাতা গোষ্ঠীর বৃহত্তর এবং অধিকতর সমন্বিত অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার দিকে তদারকিকে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে যে দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে অনেক কথা আছে যেগুলো অলঙ্কার, আছে কথার মারপ্যাঁচ, আছে ধোঁকাবাজি, আছে সারহীন অনেক প্রস্তাবনা। ভাল করে বিশ্লেষণ করলে নানা বাগাড়ম্বরের মধ্যে যে কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ প্রকৃতই আগ্রহী সেগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলোর মধ্যে আছে :

১. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি হ্রাস। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ অথবা বন্ধ করে দেয়া। বিরাষ্ট্রীয়করণ আরও দ্রুততর করা। শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, রেলওয়ে, জাহাজ ও টেলিকমিউনিকেশন খাত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে যাওয়া।

২. বিদেশী বিনিয়োগের জন্য অধিকতর আনুকূল্য সৃষ্টি। গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিকমিউনিকেশনসহ বিভিন্ন খাতে বিদেশী বিনিয়োগ সম্প্রসারণে অধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. কৃষিতে নতুন বীজ প্রবর্তন, সেচ, সারের ব্যবহার সম্প্রসারণ। কৃষিতে নতুন বীজ প্রবর্তনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. রফতানিমুখী শিল্প বিকাশে গুরুত্ব এবং অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। বৃহৎ নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতি মনোযোগ। অশিল্প কর্মসংস্থানকেই সামনে আনা।

৫. শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে এনজিও এবং বেসরকারি দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

৬. করজাল সম্প্রসারিত করা।

৭. প্রচলিত 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' সমন্বিত ও শক্তিশালী করা।

এছাড়া আছে সর্বক্ষেত্রে বাজারমুখী আরও সংস্কারকাজ করা। যদিও আশপাশের কয়েকটি দেশের তুলনায় তো বটেই, বিশ্বের বহু প্রান্তস্থ অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশে উপরোক্ত 'সংস্কার' অনেক দ্রুতগতিসম্পন্ন হলেও বারবার সেগুলোকে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন করবার জন্য বলা হয়েছে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলপত্রে।

এই প্রতিটি কর্মসূচিই আসলে পুরনো, বাংলাদেশে এগুলো চলছে বহুদিন ধরে। তাহলে এগুলোর মধ্যে নতুন কী? আর বিশ্বব্যাংক-আইএমএফই বা কেন এই কর্মসূচি নিয়ে এত নাছোড়বান্দা? পুরনোগুলো নিয়ে তার কর্তৃত্ব ও কাজে তো কোনো বাধাবিঘ্ন নেই। তবুও ভাঙচুর ও অঙ্গীভবন আরও সমন্বিত ও দ্রুততর করবার প্রয়োজনেই এই নতুন দলিল দরকার। কারণ এই 'দেশীয় মালিকানাধীন' পিআরএসপি এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে তাদের এজেন্ডার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে, যার সঙ্গে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বা বিমোচনের সম্পর্ক নেই, একটি ভাল হাতিয়ার প্রদান করছে এবং নিজেদের পুরনো অপরাধকে নতুন মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখার সুযোগ দান করছে। এইসব কাজই এতদিন 'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি' বা স্যাপ নামে হয়ে এসেছে। 'স্যাপ' নাম বা সংস্কারের আওয়াজ এখন বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ ও বিশ্লেষণের মুখে প্রতারণার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তাই এতদিন স্যাপ নামে যা হতো তাই এখন হবে শ্রুতিমধুর শব্দাবলী দিয়ে মোড়ানো 'পিআরএসপি' নামে। বস্তুত এসব কর্মসূচির সাইনবোর্ড যাই থাক বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর বিভিন্ন খাতে কি কি কাজ হবে তা বিভিন্ন প্রকল্প চুক্তি, সমঝোতা অনুযায়ী অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। সরকার পরিবর্তনে এগুলোর পরিবর্তন হয় না। নিজেদের মধ্যে নানারকম ঝগড়াঝাঁটি থাকলেও এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারের মধ্যে শুধু ঐক্য নয় অধিকতর বাস্তবায়নে প্রতিযোগিতা আছে। এগুলো যে সরকারসমূহ বা এদেশের অনুজ সুবিধাভোগীরা 'ইচ্ছার' বিরুদ্ধে করছে তা নয়। এগুলো 'বড়ভাই'-এর আশীর্বাদ ও সমর্থনে তাদের স্ফীতি ও ক্ষমতা সম্প্রসারণে অন্যতম অবলম্বন। ফলাফল কী পেয়েছি আমরা এতদিনে?

উন্নয়ন নয়, টেকসই দারিদ্র্য

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি, এখন ২০০২ সালে একই হিসাব অনুযায়ী, বহুবিধ 'সংস্কার' ও 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশে এই পর্যায়ের মানুষের সংখ্যা ৭ কোটিরও বেশি, স্বাধীনতা লাভকালীন সময়ের জনসংখ্যা। দারিদ্র্য বিমোচন-এর জন্য জিডিপি বৃদ্ধি করা উচিত এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো উচিৎ এই দুই ধরনের বক্তব্যই আমরা বেশ শুনি। ১৯৮৪/৮৫ থেকে ২০০০/১ পর্যন্ত সময়কালে, স্থির মূল্যে, বাংলাদেশে জিডিপি বেড়েছে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। এই একই সময়কালে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে বরাদ্দ বেড়েছে শতকরা প্রায় ৭০০ ভাগ। কিন্তু এই সময়ে দারিদ্র্য অনুপাতের চিত্র কী?

১৯৮৩-৮৪ সালে ক্যালোরি গ্রহণ ভিত্তিক দারিদ্র্য অনুপাত ছিল শকতরা ৬২.৬ ভাগ, ২০০২ সালে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০। প্রায় ১৮ বছর পর দারিদ্র্য বিমোচনের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে বছর প্রতি ০.৭২ ভাগ। আবার এই প্রবণতাও একরৈখিক নয়। এই হার ক্রমাগত কমছে না। এর মধ্যে নানা মাত্রার ওঠানামা আছে। যেমন ১৯৯১/৯২-তে আমরা দারিদ্র্য সীমার নিচে জনসংখ্যা পাই শতকরা ৪৭.৫। ৯০-এর দশকে জিডিপি বেড়েছে প্রায় ৫০ ভাগ, দারিদ্র্য বিমোচন নামে বরাদ্দ এই দশকে বেড়েছে সবচাইতে বেশি। এই দশকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এনজিও তৎপরতা, প্রভাব, নিয়ন্ত্রণও বেড়েছে; বাজার মুক্ত হয়েছে, উদার হয়েছে, বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বেড়েছে, ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এই দশকেই। কিন্তু সরকারি তথ্য বলে এই দশকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা শতকরা অনুপাতে ৪৭.৫ থেকে বেড়ে, ৫০-এ পৌঁছেছে। এটাকেই বলা হয় দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্য, যার উপর দারিদ্র্য বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করছে! ৩০ বছরে এভাবেই 'টেকসই উন্নয়ন' কথার আড়ালে দারিদ্র্যকে টেকসই করবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় দুর্বৃত্ত অর্থনীতি ও শিল্পধ্বংসী লুম্পেন কোটিপতিদের বিকাশ ও সংহতকরণ হয়েছে।

গণহত্যা ও দারিদ্র্য বিমোচন: বিশ্বব্যাংক

এই পুরো প্রক্রিয়ায় 'ফ্রেন্ড, ফিলোসফার ও গাইড' হিসেবে কাজ করেছে বিশ্বব্যাংক এবং তার সঙ্গে আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাসহ আরও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এসব সংস্থাকে একসাথে বলা হয় 'দাতা সংস্থা'। ভুল ও প্রতারণামূলক নাম। এদের শক্তি, কর্তৃত্ব এবং কাজ বিশ্বের বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা এবং পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর কর্মচারী হিসেবে নির্দিষ্ট। ১৯৭০ দশকের প্রথম থেকেই দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বব্যাংকের বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। এরপর থেকে বিশ্বব্যাংক যা কিছু করেছে সবই

করেছে, তাদের ভাষায়, ‘দারিদ্র্য বিমোচন’কে সামনে রেখে। তবে ফলাফল আবার তাদের দলিল থেকেই প্রকাশ পায় যে, বিশ্বব্যাপী সম্পদ বৃদ্ধি সত্ত্বেও ঘটেছে একদিকে দারিদ্র্যের বিস্তার এবং অন্যদিকে বৈষম্য ও বঞ্চনার বৃদ্ধি।

দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বব্যাংকের মনোযোগের সূত্রপাত ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের এক বক্তৃতা থেকে। সেসময় এর প্রধান ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা, যিনি ভিয়েতনাম গণহত্যার সময়ও এই দায়িত্বে ছিলেন। যুদ্ধ-ধ্বংস ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি কি করে বিশ্বব্যাংকের মতো বিশ্ব উন্নয়ন সংস্থার প্রধান হলেন সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু খেয়াল করলে এর মধ্যে কোন কাকতালীয় কিংবা ব্যতিক্রম কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ বিশ্বব্যাংক যদিও বিশ্বের সকল দেশের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণভাবে উপস্থিত হয় কিন্তু এটি সকল বিচারেই সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের একটি সম্প্রসারণ। এর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, এর প্রধান বাধ্যতামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন অনুমোদিত, এর সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি।

যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল একাউন্টেন্ট অফিস মাঝেমধ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী এর নির্ধারিত ভূমিকা ও দক্ষতা নিয়ে তদন্ত করে। ভূমিকা পালনে কোন ত্রুটি হলে কংগ্রেস ও ট্রেজারি বিভাগ যেকোনোভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে এর উদাহরণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের দুজন শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ-এর বিশ্বব্যাংক থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া। এঁরা হলেন প্রথমে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জোসেফ স্টিগলিজ যিনি বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন তিনি বিশ্বব্যাংকের ‘ভুল সংশোধনের’ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবং পরে রাভি কানবুর যিনি বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য বিষয়ক বিশ্বরিপোর্ট-এর মূল দায়িত্বে ছিলেন। এঁদের এই অবস্থা হয় ট্রেজারি বিভাগের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতের কারণে।

তাছাড়া, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থায় উন্নয়ন এর যে ধারা তা আবার যুদ্ধ-ধ্বংস ও গণহত্যার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সেজন্য এই ব্যবস্থার গুরু যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তি আদিতে যুদ্ধ বা সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত, মার্কিন সিআইএ বা প্রতিরক্ষা বিভাগের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সেজন্য হিরোশিমা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে ৭১-এর বাংলাদেশ হয়ে বর্তমান আফগানিস্তান, ইরাক বা প্যালেস্টাইন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা গণহত্যাকারীর এবং বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা গণহত্যা ও ধ্বংসের একান্ত সহযোগীর।

বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থাবলীকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থিত করাটা খুবই ধারাবাহিক ও ‘যুক্তিযুক্ত’ প্রতারণা

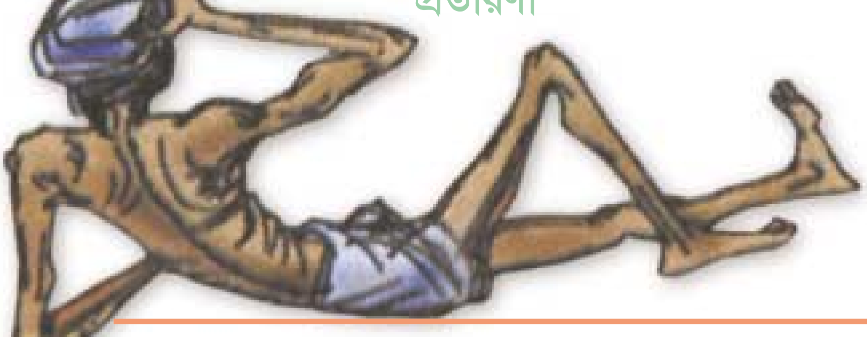

উপরন্তু, এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কোনো দেশে শাসক দুর্নীতিবাজ, নির্যাতক, দেশের সম্পদ লুন্ঠন ও পাচারে নিয়োজিত আর সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নেই, নেই বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা। আবার এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেখানে দুর্নীতি, নির্যাতন, লুন্ঠন আর পাচারের বিরুদ্ধে কোনো সরকার দাঁড়াতে চেষ্টা করছে আর তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র তার সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং বিশ্বব্যাংক তার সকল শক্তি নিয়ে তৈরি করছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা। বস্তুত কোনো দেশে দুর্নীতিবাজদের একটি ভাল ভিত্তি তৈরি না হলে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ-এর পক্ষে কাজ করাই অসম্ভব। কেননা এই প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের নামে যেসব প্রকল্প হাজির করে সেগুলো দুর্নীতির ওপর ভর করেই তার যাত্রা শুরু করে এবং নতুন দুর্নীতিগ্রস্ত এক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে শেষ হয় কিংবা চলতে থাকে।

বিশ্বব্যাংকের নতুন-পুরনো শব্দ কিংবা কর্মসূচি

ভিয়েতনাম গণহত্যার সঙ্গে জড়িত বিশ্বব্যাংকের প্রধান ম্যাকনামারা ১৯৭৩ সালে বিশ্বদারিদ্র্য নিয়ে আকুল হয়ে যে বক্তৃতা দেন তা থেকে এরকম ধারণা অনেকেই করে থাকতে পারেন যে, বিশ্বব্যাংক বুঝি বদলালো, মনে হয় এখন নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত

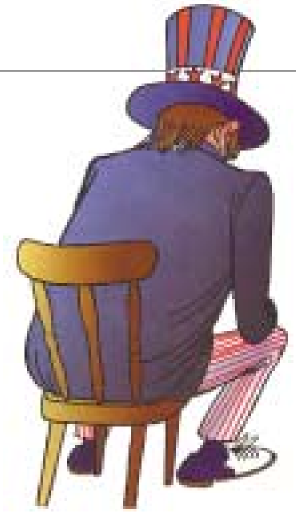

এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যেখানে কোনো দেশে শাসক দুর্নীতিবাজ, নির্যাতক, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচারে নিয়োজিত আর সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নেই, নেই বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতা

করতে নেমেছে। কেননা সেই বক্তৃতাতে এই স্বীকৃতি ছিল যে, বিশ্বে সেই সময় পর্যন্ত যে উন্নয়ন কৌশল নেয়া হয়েছে তাতে দারিদ্র্য পরিস্থিতির বরঞ্চ আরও অবনতি হয়েছে। বলা দরকার যে, ৫০ ও ৬০ দশক বিশ্বব্যাপী প্রাক্তন উপনিবেশগুলিকে নতুনভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত করবার কর্মসূচি জোরদার গতিতে চলেছে আর সেই কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'সবুজ' বিপ্লব : কৃষি খাতে বিষ প্রয়োগ শুরু, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে হানা দেয়া; খাদ্যের জমি দখল করে রফতানিমুখী পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করা; খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার নতুন দখলপর্ব এবং এগুলো নিশ্চিত করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বৈরশাসন ও সামরিক অভিযান ।

আর এই কর্মসূচির সময়েই বলা হয়েছে, সরকার-আন্তর্জাতিক সংস্থা- পোষ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দারিদ্র্য এর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যাবে, অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের এটাই একমাত্র জাদুকরী পথ। এই পথের সাথে দেশে দেশে এসেছে অর্থনৈতিক বৈকল্য এবং সামরিক শাসন, নির্যাতন ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য। এসবের সাথে বরাবর যুক্তরাষ্ট্র ছিল, ছিল বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ। ৬০ দশক শেষ হতে হতে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দুক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। তবে এই অবস্থার কারণেই যে বিশ্বব্যাংকের বোধোদয় হয়েছিল তা নয়, তার বোধোদয় কিংবা ঠিকভাবে বললে আত্মরক্ষামূলক ধরনের অবস্থান 'পরিবর্তন'-এর পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে দেশে দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার।

দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বব্যাংকের হাহুতাশ ও তার অর্থায়নে পুষ্ট হয়ে ৭০ দশকে দারিদ্র্য বিষয়ক অনেক গবেষণা, গ্রাম বিষয়ক অনেক পরিকল্পনা-সমীক্ষা হতে থাকে। গ্রাম উন্নয়নই হয়ে দাঁড়ায় তখনকার প্রশাসন-আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল স্লোগান। সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট গ্রুপ এপ্রোচ ও অংশগ্রহণভিত্তিক উন্নয়নকে ধরে এনজিও প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে থাকে সেই সময় থেকেই। পরে এই এনজিও এবং 'সেফটি নেট' কর্মসূচি হয়ে দাঁড়ায় বীভৎস বিশ্ব ব্যবস্থার মোলায়েম হাত, নরম চেহারার মুখোশ কিংবা ফার্স্ট এইড বক্স। এই বীভৎস ব্যবস্থার বিনিয়োগ-ব্যবস্থাপক বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ আসলে এনজিও ধরনের কর্মসূচিকে যুক্ত করা ছাড়া ৭০ দশকে তাদের 'মূলধারার' কর্মসূচিতে কিছুমাত্র বদল আনেনি। তাদের এজেন্ডা সাধারণত বিভিন্ন ঋণের সঙ্গে শর্ত হিসেবে উপস্থিত হত।

তাদের এজেন্ডা বা কর্মসূচির মধ্যে ছিল: (১) বিরাষ্ট্রীয়করণ অর্থাৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত ভেঙে দেয়া। (২) আমদানি ও রপ্তানির শুল্ক-অশুল্ক সকল বাধা বা নিয়ন্ত্রণ দূর করা। (৩) মুদ্রার অবমূল্যায়ন। (৪) শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সকল ক্ষেত্রকে অধিক থেকে অধিকতর হারে বাজারমুখী করা। (৫) রাষ্ট্রের দায়িত্ব হ্রাস করা। (৬) বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ লাভজনক করবার জন্য নানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। (৭) খনিজ সম্পদসহ সাধারণ সম্পত্তি ব্যক্তিমালিকানায় এবং বিশেষভাবে বহুজাতিক সংস্থার কর্তৃত্বে নিয়ে আসা। (৮) সম্পদ পাচার সহজতর করা। (৯) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ না করা। (১০) গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মতো পরিসেবা যা প্রায় সবদেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যোগান দেয়া হতো সেগুলোর দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা।

৭০ দশকের প্রথম থেকেই অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আমরা ক্রমে এসব কর্মসূচিকে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন'-এর চিন্তা-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখতে পাই। ৮০ দশকের প্রথম পর্যন্ত এসব কর্মসূচি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে আরোপিত হতো। এর পর 'আরেকটি' উন্নয়নের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ : তাদের হাতে থাকে 'ওয়াশিংটন কনশেনশাস'-এর পতাকা, কর্মসূচির নাম দেয়া হয়: কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম)। এটা আর কিছু ছিল না, এতদিনকার, উপরে বর্ণিত কর্মসূচিকে একটি একক প্যাকেজের মধ্যে নিয়ে আসা। এই কর্মসূচি নিয়ে আমরা প্রচুর হট্টগোল শুনেছি। আমরা শুনেছি যে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ঘাটতি সমস্যা দূর হবে, সামষ্টিক স্থিতিশীলতা আসবে, অর্থনীতিতে গতি আসবে, শিল্পায়ন হবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে, রপ্তানিতে বহুমুখিতা আসবে, বেসরকারি খাতের উল্লম্ফন বিকাশ হবে।

এই প্রচারণার পাশাপাশি বাস্তব চিত্রের বৈপরীত্য এত বেশি ছিল যে, ৮০ দশকের শেষ থেকেই দেশে দেশে এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৯০-৯১ তে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ ধসে পড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে এই ব্যবস্থার কেন্দ্র রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাংক ও

আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোরও কর্তৃত্ব এবং খবরদারি বৃদ্ধি পায় অনেকবেশি। কিন্তু একই সময়কালে, যখন প্রান্তস্থ দেশগুলো সবল আক্রমণ ও ভাঙচুরের মুখে বিপর্যস্ত, তখন এসব প্রতিষ্ঠান ও একক কেন্দ্রের নিশ্চিত কর্তৃত্ব পশ্চিমের দেশগুলোতেই উত্তরোত্তর সমালোচনার মুখে পড়তে থাকে। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অভিজ্ঞতার ভয়াবহতা বিভিন্ন দেশে এমন রূপ নেয় যে, ১৯৯৪ সালে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের যখন ৫০ বছর পূর্তি হচ্ছে তখন তাদের উৎসব ম্লান করে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। প্রতিবাদীদের উদ্যোগে গণআদালত গঠিত হয় খোদ যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৯৫ সালে গ্যাট চুক্তি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা বিশ্ব ক্ষমতার কেন্দ্রকে অনেক সংহত করে কিন্তু একই সঙ্গে এদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা ও সত্য উন্মোচন করা ক্রমে আরও সংহত রূপ পেতে থাকে।

এরকম আক্রমণের মুখে, ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ওলফেনসন যে ভাষণ দেন তাকে তুলনা করা চলে ১৯৭৩-এর ম্যাকনামারার ভাষণের সঙ্গে। এই ভাষণেও একইভাবে বিশ্বের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিয়ে হাহাকার এবং দারিদ্র্য মোকাবেলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুনভাবে কর্মসূচি বিন্যাসের তাগিদ দেয়া হয়। তিনি ঐ ভাষণে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক বিবরণী ও কৃতিত্ব জাহিরের বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে বলেন, “যখন সারা গ্রামে আগুন লেগেছে তখন আর গেরস্থের দিনের হিসাবনিকাশ দিয়ে কী হবে?” তিনি স্বীকার করলেন, দারিদ্র্য পরিস্থিতি বিশ্বব্যাপী অধিকতর খারাপ হয়েছে, বৈষম্য বেড়েছে এবং নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে আগের তুলনায় বেশি। বিশ্বব্যাংকের প্রধানের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি পেতে অনেক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্ম দিতে হয়েছে। ততদিনে ঋণ মওকুফের দাবি উঠেছে মহাঋণগ্রস্ত দেশগুলো থেকে। এগুলোকে অনুগ্রহ প্রার্থনা হিসেবে উপস্থিত করবার চেষ্টা করা হলেও আসলে এখানে অনুগ্রহ প্রার্থনার কিছু নেই। কেননা ঋণগ্রস্ততা তৈরি হয়েছে ঐসব দেশের লুটেরা এবং আন্তর্জাতিক লুটেরাদের যৌথ কর্মকান্ড দ্বারা।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর বার্ষিক সভার শেষে এল তাদের যৌথ ঘোষণা। দারিদ্র্যহ্রাস তাদের এখন প্রধান এজেন্ডা, এবং দরিদ্র প্রধান দেশগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি ‘সাহায্যের’ মূল ভিত্তি হবে। তাছাড়া ঋণ মওকুফ পেতে গেলেও এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। পিআরএসপি-র সেই শুরু। এবারেও সেই পুরনো ভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা, হয়তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং তারা হয়তো আসলেই এবার বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করবার কাজে নামবে বিশ্বব্যাংক। বিশ্ব দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বব্যাংক থেকে বিশেষ বিশ্ব রিপোর্ট এবং বাজারের বাইরে নানা বিষয় দেখে, না শোনা কণ্ঠ শুনে (আনহার্ড ভয়েসেস) তার উপর বড় বড় রিপোর্ট প্রকাশিত হল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একটু নড়চড়-এর লক্ষণ সন্দেহ করে বাড়ি দিল মার্কিন প্রশাসন। কয়েকমাসের মধ্যে স্টিগলিজ এবং কানবুর চাকরি হারালেন।

১৯৯৯ সালের নবেম্বরে সিয়াটলে সূত্রপাত হয়েছিল নতুন অধ্যায়ের। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন স্থল হাজার হাজার তরুণ প্রতিবাদীর প্রতিবাদে অচল হয়ে পড়েছিল। এই ঘটনা ছিল বিশ্বব্যাপী এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। কেননা এর পর থেকে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনটিই আর আরামমতো নিজেদের সভা-সম্মেলন করতে পারে নি। সবসময়ই তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে বিশাল প্রতিবাদের। প্রতিবাদ এড়াতে গিয়ে জি-৮ দেশের শীর্ষ সম্মেলন শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমির শাসিত দোহা-তে। কিন্তু কতবার কতদিন? জনরোষের মুখে আমিরের নিরাপত্তাই বা কে দেবে?

পিআরএসপি তাই একদিকে স্যাপ-এর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে সবাইকে এটা দেখানোর চেষ্টা যে, এটা ভিন্ন কিছু। অন্যদিকে আগের একই কর্মসূচি এমন এক নামে উপস্থিত করা যাতে প্রতিবাদের ভাষা দুর্বল হয়। ‘দেশীয় মালিকানা’-র ওপর জোর দেবার প্রধান কারণ এর সব দায়দায়িত্ব দেশীয় অনুজদের কাঁধে স্থানান্তর করা।

কর্মসূচির ধারাবাহিকতা : উৎপাদনশীল খাতের ধস

বাংলাদেশের জন্য প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন পিআরএসপি-তে বলা হয়েছে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা হবে এবং বলা হয়েছে এর জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭-এ উন্নীত করতে হবে এবং তা ১৫ বছর ধরে অব্যাহত থাকতে হবে। আরও বলা হয়েছে এটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর সঙ্গে পূর্বে অঙ্গীকৃত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর আওতায় পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট অন পভার্টি রিডাকশন-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আগেই বলেছি, এরকম আরও বহু অঙ্গীকার , সমঝোতা আর চুক্তি দ্বারা বাংলাদেশের গন্তব্য বহু আগেই নির্ধারিত।

বাংলাদেশে এতদিন স্যাপ-এর নীট ফলাফল হলো , শিল্পখাতে ধস। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলো নয়, অজস্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ৮০ ও ৯০ দশকে বন্ধ হয়েছে। তার ফলে জিডিপি-তে শিল্পখাতের আনুপাতিক অবদান ৮০ দশকের প্রথম দিকে যা ছিল তার তুলনায় কমে গেছে। স্পষ্টত এই দু’দশকে উন্নয়নের বহু প্রকল্প এবং নানা কর্মসূচির ফলাফল হিসেবে শিল্পখাতে নেমেছে ধস। সেজন্য রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানগুলোর সংযোজন সত্ত্বেও জিডিপির অনুপাত এবং কর্মসংস্থান উভয় দিকেই ক্ষয় দেখা যায়। ৮০ দশকের শেষে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান ছিল ৭০ লক্ষ, ৯০ দশকের শেষে এসে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গার্মেন্টস শ্রমিক যোগ হবার পরও তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ। অনুমান করা শুধু নয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, পুরনো কারখানাগুলো একের পর এক আক্রমণে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শেষ আক্রমণের অপেক্ষায় ধুঁকছে। দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে যখন হাজার হাজার কোটি টাকার উৎসব চলছে বাংলাদেশে, যখন দারিদ্র্য হ্রাসকরণের আরেক তরবারি জনগণের মাথার উপরে তখন প্রতিবছর বাংলাদেশে শিল্পখাত থেকে শ্রমিক উচ্ছেদ হয়েছেন ৩ লক্ষ। প্রতিবছর ৩ লক্ষ শ্রমিক আর তার সঙ্গে পরিবারবর্গকে দারিদ্র্যসীমার নিচে নিক্ষেপ করে দারিদ্র্য বিমোচনের সমবেত সঙ্গীত দিয়ে তার চিৎকার ঢেকে দেয়া হয়েছে।

তাই বিস্ময়ের কিছু নেই যখন আমরা দেখি পিআরএসপি দলিলে শিল্পখাতকে প্রান্তিক করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অশিল্পখাত, ইনফরমাল খাত, টুকরো টুকরো ভাসমান অনিশ্চিত কাজের খাতগুলোকেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের চেহারাও তাই দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনার কথা দলিলে উল্লেখও করা হয়নি, কারণ এই নীতি প্রক্রিয়াতেই বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পগুলো আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি কিংবা চট্টগ্রাম স্টিল মিলস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এমনি এমনি নয়। এসব প্রতিষ্ঠান একটি অর্থনীতিতে শিল্পায়নের ভিত্তি নির্মাণ করে। বিশিল্পায়ন যেখানে পরিকল্পিত নীতি সেখানে এসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবার কথা নয়। এসব প্রতিষ্ঠান গেছে যে নীতি প্রক্রিয়ায় সেই একই প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পসমূহের দাঁড়ানোও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বৃহত্তম পাটকল আদমজী পাটকল বন্ধ হল কোনো পর্যালোচনা ছাড়া, লোকসানের দায়দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা ছাড়া। এটাও নিছক কাকতালীয় নয় যে, যখন বাংলাদেশে পাটকল বন্ধ হল তখন পশ্চিমবঙ্গে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনটি পাটকল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হল এবং বাংলাদেশ সরকার ভারতে কাঁচাপাট রফতানির বিষয়ে আলোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করলো।

বিদেশী বিনিয়োগ পিআরএসপি-র

অন্যতম মনোযোগের জায়গা। তবে এযাবৎকাল বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ-এর ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনার কোনো আগ্রহ যথারীতি এই রিপোর্টে দেখা যায়নি। কেননা তা বিপজ্জনক। আর এসব কোন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার ফলাফল বিচারের ওপর নির্ভরশীল নয়। নির্ভরশীল যেকোনভাবে যতদ্রুত সম্ভব বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুনাফা সর্বোচ্চ করার ওপর। বাংলাদেশে বড় আকারে বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে। প্রথমে কাফকো এবং পরে তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ। এছাড়া টেলিকমিউনিকেশনসহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে। কাফকোতে বিনিয়োগ-এর পরিণাম আমরা জানি। ভর্তুকি দিয়েও এই প্রতিষ্ঠান লাভজনক করা যায়নি বরঞ্চ অর্থনীতির অব্যাহত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তেল-গ্যাসে বিদেশী বিনিয়োগের পরিণাম স্পষ্টত দাঁড়িয়েছে দেশীয় ক্ষমতা ধ্বংস, গ্যাসের অব্যাহত দাম বৃদ্ধি, গ্যাসসম্পদ লুন্ঠন ও পাচারের বন্দোবস্ত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ ও ঘাটতি বৃদ্ধি, বিদ্যুতে বিনিয়োগের পরিণাম বিদ্যুতের অব্যাহত দাম বৃদ্ধি। গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি তাই এখন একটি নিয়মিত ঘটনা এবং এই চুক্তি অব্যাহত থাকলে সামনে এর আরও বৃদ্ধি আমরা দেখবো। পিআরএসপি এগুলোকে আরও কার্যকর করবার আহবান জানাচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্থনীতিতে বোঝা কঠিন নয়। এর ফলে প্রতিটি উৎপাদনশীল খাতের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটবে, প্রতিটি উৎপাদিত দ্রব্য প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আরেকদফা হারাবে, টিকে থাকা কঠিন হবে অনেকের, দ্রব্যমূল্য বাড়বে, জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে। আরও অনেক মানুষ উৎপাদনশীল কর্মকান্ড থেকে ছিটকে পড়বে দারিদ্র্যসীমার নিচে।

বাংলাদেশের পিআরএসপি দলিল রাষ্ট্রীয় সার্ভিস থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারকে দারিদ্র্য বিমোচন-এর পথ হিসেবে নির্দেশ করেছে কিন্তু মুখ ফসকেও একবার বলেনি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেয়া নানা ধরনের ভর্তুকি প্রত্যাহার-এর কথা, কিংবা ব্যাংক ডাকাতদের হাত থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ উদ্ধারের কথা। বরঞ্চ তাদের কর্মসূচি এগুলোর বৃদ্ধিরই ইঙ্গিতবহ।

অর্থনীতি উন্নয়নের 'সাহায্য প্রকল্প': নতুন লক্ষ দরিদ্র নতুন বিপন্ন জনপদ

আন্তর্জাতিক সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্রসহ জি-৭ ভুক্ত দেশগুলো আমাদের সাহায্য করে বলে একটা মিথ তৈরি করা হয়েছে। এই মিথ সবাইকে বিশ্বাস করতে বলে যে, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি সংস্থা ঋণ-অনুদান দেয় উন্নয়নের জন্য, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং আমাদের দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য। এই ধারণা বদ্ধমূল হয় তথ্য গোপন কিংবা জালিয়াতিপূর্ণ উপস্থাপনের কারণে। কিন্তু মোহমুক্ত ভাবে পুরো বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা যে চিত্র পাই তা এক ভয়াবহ জালের ও অবাধ ধ্বংসযজ্ঞের। 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি ব্যবস্থাপনার' প্রকল্পে ঋণ নিয়ে ফলাফল দাঁড়ায় : অবাধ জলপ্রবাহের দেশ পরিণত হয় স্থায়ী জলাবদ্ধতার দেশে এবং বন্যা, নদী ভাঙনের আরও স্থায়ী রূপপ্রাপ্তি। জ্বালানি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল: তেল গ্যাস সম্পদের উপর বহুজাতিক সংস্থার দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠা। মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল: কৃষি জমি ধ্বংস করে চিংড়ি উৎপাদন। বন উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল: প্রাকৃতিক বন ধ্বংস ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্ষতিকর গাছের 'বন' তৈরি। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল: নতুন হাইব্রিড/টারমিনেটর বীজ আগ্রাসনে কৃষিকে নিক্ষেপ করা। বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পের ফলাফল: উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় ও তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মতো বিদেশী বিনিয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো নিছক দুর্নীতি নয় এগুলো পরিকল্পিত 'উন্নয়ন' কৌশল। বাংলাদেশের মানুষকে যার ফল শুধু ভোগ করতে হবে না এর জন্য আনীত ঋণের দায়ও বহন করতে হবে। এখানে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে পারে।

আদমজী পাটকল বন্ধ হল গত ৩০ জুন। কিন্তু আদমজী পাটকল বন্ধসহ পাটশিল্প বিনাশ ও শ্রমিকদের বেকার বানানোর জন্য বাংলাদেশকে ঋণ দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ সালে। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করে সেদিন একটি প্রকল্প অনুমোদন করে যার নাম ছিল 'জুট সেক্টর এডজাস্টমেন্ট ক্রেডিট'। এই প্রকল্পের আওতায় ঋণ দেয়া হয়েছে তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। গত ৩০ বছরে আদমজী পাটকলে যে লোকসান হয়েছে বলে বলা হচ্ছে এর পরিমাণ তার চাইতে বেশি। পাটখাতের জন্য বিশ্বব্যাংকের দেয়া এতগুলো টাকা 'সাহায্য' হিসেবেই জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাগজপত্রে এই তহবিল কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত পাটখাত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসেবেই তালিকাভুক্ত হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে কি ছিল সেই টাকাপয়সার গন্তব্য? সেটা কি পাটখাত বিকাশের জন্য? সেটা কি নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য? নতুন পণ্য নিয়ে গবেষণার জন্য? সেটা কি নতুন বিশ্ববাজার অনুসন্ধানের জন্য? সেটা কি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য? সেটা কি দক্ষতাবৃদ্ধির আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা বিকাশের জন্য? না, এর কোনোটাই নয়। বাংলাদেশের মানুষের নামে, তাদের দায়িত্বে বিশ্বব্যাংক থেকে দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি এই ঋণ নেয়া হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের জন্য। সেগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল: (১) ২৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের মধ্যে ৯টি বন্ধ করে দেয়া; (২) অবশিষ্ট ২০টির মধ্যে ১৮টি বেসরকারিকরণ করা; এবং (৩) ২০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা। তার মানে হল বাংলাদেশের মানুষ সুদ দিয়ে ঋণ নিয়েছেন মিল করবার জন্য নয়- মিল বন্ধ করবার জন্য এবং নতুন কর্মসংস্থানের জন্য নয় বরং শ্রমিক ছাঁটাই করবার জন্য।

এই চুক্তির মধ্য দিয়ে কি তবে পাটখাতে বেসরকারি শিল্প লাভবান হয়েছিল? ১৯৯৪ সালের এই ঋণ কমসূচি নিয়ে বেসরকারি খাতের কিছু ব্যক্তি, যাদেরকে এই কমসূচির সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল সেরকম কয়েকজন ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বব্যাংক বরাবর পত্র দেন। সেই পত্রে তাঁরা, অর্থাৎ বেসরকারি মালিকেরা বলেন, "সংস্কার কর্মসূচির জন্য আগের চাইতে তাদের কারখানাগুলোর অবস্থাও আরো খারাপ হয়েছে।" তাঁরা বলেছেন, এই কর্মসূচির ফলে (১) বেসরকারি মিলগুলোর কার্যক্ষমতা কমেছে; (২) প্রকৃত উৎপাদন ও রফতানি কমেছে; (৩) বেসরকারি কারখানার বাজার মূল্যে পতন ঘটেছে; (৪) ১১টি বেসরকারি কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা কমেছে বা (অ)স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেবার পেছনে প্রধান এবং মোক্ষম যুক্তি হল এই কারখানা খোলা রাখলে যত ক্ষতি, বন্ধ রাখলে তার থেকে বেশি ক্ষতি। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে লোকসানের কথা প্রচারে সবার বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা গেলেও এর কারণ অনুসন্ধানে, এর দায়দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণে সরকারের কোনো কমিটি গঠিত হয়নি, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির কোনো প্রকল্পও তৈরি হয়নি। বরঞ্চ এসব লোকসানি প্রতিষ্ঠান যেসব আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে তারাই নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন, কেউ তিরস্কৃত হয়নি, জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়নি। যেসব আমলা দক্ষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশ্বব্যাংক প্রভৃতিতে যোগ দেন তারা তো এদের মধ্যে থেকেই আসেন। আসলে লোকসান কথাটা পুরো খাতকে বসিয়ে দেয়ার যুক্তি হিসেবে মোক্ষ হলেও এগুলোকে লাভজনক করবার চেষ্টা তো হয়ইনি বরঞ্চ এধরনের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে লাভজনক অনেক প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বেসরকারি খাত যে এসবের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে তাও নয়। একই ধরনের নীতি বেসরকারি খাতকেও দাঁড়াতে দেয়নি। পিআরএসপি এসব শিল্প বন্ধ, কর্মসংস্থান হ্রাস সংক্রান্ত নীতিগুলোকেই নতুন মোড়কে উপস্থিত করেছে।

বাংলাদেশে যখন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি নিয়ে বিষম হৈচৈ ঠিক তখনই বন্ধ করা হলো আদমজী পাটকল। প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক, তার সঙ্গে আরও কয়েক হাজার বিভিন্ন কর্মজীবী এর মধ্যে দিয়ে সরাসরি তাদের জীবিকার অবলম্বন থেকে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিটকে পড়লেন। তাদের পরিণতি কি? পরিণতি আমাদের অপরিচিত নয়: বেকার বাড়বে, সেই কারণে আশ্রয়হীন বাড়বে, পরিবার ভাঙবে, নারী-শিশুর নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে অধিক হারে, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রী বাড়বে, শিশুশ্রমিক বাড়বে, ভাসমান পতিতা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। এই একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এক ধাক্কায় লক্ষাধিক মানুষ সরাসরি দারিদ্র্যসীমার নিচে নিক্ষিপ্ত হবেন। এই পাটকলের সঙ্গে বহুভাবে যুক্ত আরও বহুলক্ষ মানুষ যারা প্রান্তিক অবস্থানে ছিলেন তারাও একই অবস্থার মুখে। দারিদ্র্য সৃষ্টির এরকম বহু প্রকল্পের সাফল্যের মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি এতদূর এসেছে। শুধু এই দেশে নয়, দেশে দেশে বিশ্বব্যাপী। আর্জেন্টিনা এই ধরনের জালে একধাপ এগিয়ে দীর্ঘ মন্দায় ডুবেছে। ভেনেজুয়েলা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছে শক্তভাবে। বাংলাদেশের শাসকদের মডেল নাইজেরিয়া, আর্জেন্টিনা।

প্রতারণা যখন ধারাবাহিকতা

যেখানে বহুজাতিক তেল কোম্পানি শেল নাইজেরিয়া এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ সহ বহু দেশে অর্থনীতি বিপর্যস্ত ও পরিবেশ বিপন্ন করে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্বের সকল প্রধান টিভি চ্যানেল, সকল প্রচার মাধ্যমে নিজেকে টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উপস্থিত করে; যেখানে মায়ানমার ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু দেশে অর্থনীতি বিপর্যস্ত করবার জন্য দায়ী আরেক বহুজাতিক তেল কোম্পানি ইউনোক্যাল বাংলাদেশে মাগুড়ছড়ায় ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পদ বিনষ্ট করবার দায়িত্ব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ব্র্যাক-কে সাথে নিয়ে কয়েক লাখ টাকার টিকা আর বই উপহার দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের শরিক হিসেবে নিজেকে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য প্রচারে উপস্থিত করে; গণহত্যাকারীরা যেখানে উপস্থিত হয় ত্রাণকর্তা হিসেবে; যেখানে বিশ্বের সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে সন্ত্রাস বিরোধী হিসেবে দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করে; সেখানে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থাবলীকে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থিত করাটা খুবই ধারাবাহিক ও 'যুক্তিযুক্ত' প্রতারণা!

গোড়াতেই গলদ

রাশেদ খান মেনন

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থনীতি। একটি দেশের রাজনীতি মূলগতভাবে তার অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনীতির যে কোনো বিতর্কে অর্থনীতি তাই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশের মত দেশগুলোতেই সে দেশের অর্থনীতিক নীতিই রাজনীতির প্রধান উপজীব্য হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অর্থনীতির দাতানির্ভর চরিত্র ঐ অর্থনীতির ভাবনাকে তাদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয় এদেশে। বাংলাদেশের ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় ঐ অর্থনৈতিক নীতি কখনো তাই রাজনীতির প্রধান বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়নি। এখনও যখন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বাংলাদেশের উপর অর্থনীতির নতুন নীতি ও কৌশল চাপিয়ে দিচ্ছে দেশের রাজনীতিতে তার বিশেষ কোনো প্রভাব নেই। সে নিয়ে বিতর্ক অথবা আলোচনা নেই। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোর জন্য সম্প্রতি যে ব্যবস্থাপত্র হাজির করেছে তার নাম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল। এই কৌশল অনুসারে দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যাংক তহবিলের ঋণসহযোগিতা পেতে হলে তাকে একটি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র বা পিআরএসপি তৈরি করতে হবে। ঐ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্রে দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কোন খাতে কি নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হবে তার বিবরণ থাকবে। এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সরকার তার বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করবে। তার অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন করবে।

বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এ ধরনের ব্যবস্থাপত্র নতুন নয়। ইতিপূর্বে আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর আর্থিক সহযোগিতা পেতে তাদের নির্দেশিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (Structural Adjustment Programme) বাস্তবায়ন করতে হয়েছে। ঐ কর্মসূচির প্রধান দিক ছিল উদারীকরণ, ব্যক্তিগতায়ন ও বিনিয়ন্ত্রণ। বাংলাদেশ গত দেড় দশক ধরে এই কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। যে সব সরকার ক্ষমতায় এসেছে তারা ঐ কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি অনুযায়ী সংস্কার কর্মসূচিকে তাদের প্রধান এজেন্ডা করেছেন। কিন্তু এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ কোনো বিতর্ক হয়নি। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর ব্যবস্থাপত্রের বিরুদ্ধে বিতর্ক উত্থাপন করলেও তাকে 'ইডিওলজিক্যাল ইস্যু' বা আদর্শগত বিতর্ক বলে পাশ কাটানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর এই কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে অর্থনৈতিকভাবে না আগিয়ে তাকে পিছিয়ে দিয়েছে। এটা কেবল অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষা নয়, বিশ্বব্যাংক নিজেও একটি অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়নে ঐ কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অসঙ্গতি ও অসারতা দেখতে পায়। ঐ অভিজ্ঞতা থেকে তারা একটি সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক নীতি সে দেশের নিজস্ব হতে হবে (nationally owned) এবং সেটা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রণয়ন করতে হবে। ব্যাংক তহবিল তার নীতি কাঠামো পত্রের পরিবর্তে যে পিআরএসপি চালু করেছে তাতে তারা এই নীতির প্রতিফলন ঘটাতে বলেছে।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর দেয়া নতুন ব্যবস্থাপত্রে ইতিমধ্যে একটি অন্তর্বর্তী পিআরএসপি তৈরি করেছে। তারা এটার নাম দিয়েছে 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য জাতীয় কৌশল'। এই কৌশলপত্র বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র হিসাবে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে তা সংযোজন, সংশোধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্রে পরিণত হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দলিলটির গোড়াতেই গলদ থেকে যাচ্ছে। এই দলিলকে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী একটি দেশের নিজস্ব বলা হলেও এর ছক ও শর্তাবলীও বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নির্দেশ করে দিয়েছে এবং ঐ কৌশলপত্র সে অনুযায়ী রচিত হয়েছে কিনা সেটাও তারাই অনুমোদন করবে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর নির্দেশনা অনুযায়ী এই দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রে দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ, নির্বাচিত কিছু অন্তর্বর্তী ফলাফলের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ, দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নীতি কৌশল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া থাকবে। দারিদ্র্যের কৌশলপত্র ছক তৈরির সময় কি কি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সংযুক্ত করা হবে তারও নির্দেশনা দিয়েছে ব্যাংক তহবিল। তার সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে।

এত শর্তের ভিড়ে আবদ্ধ জাতীয় দায়দায়িত্ব ভিত্তিক (?) কৌশলপত্রের মালিকানা যদি এ দেশের মানুষের কাছেই রাখতে হয় তবে সেটা প্রণীত হতে হবে এ দেশের মানুষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। এটা অনুমোদন ও চূড়ান্তকরণের দায়িত্ব বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর হতে পারে না এটা হতে হবে এ দেশের জাতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায়। স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে। এই দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রে নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ণয়েও জনগণের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণ অপরিহার্যভাবে থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে অবশ্য বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থাসমূহ থেকে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনার দাবি উঠেছে। তার জন্য ঐ কৌশলপত্র প্রণয়নের সময়সীমা বাড়ানোর দাবিও করা হয়েছে। কিন্তু এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব যে রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের থাকবে তাদের এই বিতর্কের ব্যাপারে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। ক্ষমতাসীন সরকারের তরফ থেকে এই কৌশলপত্র রচনার দায়িত্ব ছেড়ে রাখা হয়েছে আমলাদের ওপর। তারা এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন পরামর্শকদের ওপর। সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কনসালটেশনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলোও হয়েছে দায়সারা গোছের। অথচ এই দারিদ্র্যহ্রাসের কৌশলপত্রই আগামী দিনগুলোর অর্থনীতিক পথচলা নির্দেশ করবে।

অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও দারিদ্র্যহ্রাস কৌশলপত্রের ব্যাপারে এ যাবৎ নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এ ধরনের একটি কৌশলপত্র রচিত হয়ে গেলে রাজনৈতিক বাধ্যকতা হিসেবেই তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে এরাও।

এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লুটিও প্রতিষ্ঠার আগে উরুগুয়ে রাউন্ড ও ডাঙ্কেল প্রস্তাব নিয়ে যখন সারা পৃথিবীতে তুমুল আন্দোলন চলছিল, এমনকি পাশের দেশ ভারতেও রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, কৃষক সংগঠনগুলোসহ বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন করেছে, তখন বাংলাদেশে বামপন্থীদের কিছু উদ্যোগ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ধারায় সে নিয়ে কোনো আন্দোলন হয়নি, এমনকি আলোচনাও হয়নি। বিশ্বব্যাংকের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থাপত্র কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি যখন চালু করা হয় তখন দেশে একটি অগণতান্ত্রিক শাসন ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটলেও জাতীয় সংসদে অথবা আর কোনো বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক হয়নি। বরং শাসন ক্ষমতায় আসীন দলগুলো ঐ সংস্কার কর্মসূচি কে কত ভালোভাবে বাস্তবায়ন করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলপত্র নিয়ে যদি সেই অবস্থা ঘটে তবে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির মত বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর এই ব্যবস্থাপত্র গলার কাঁটা হিসেবে আটকে থাকবে। সে কারণেই দারিদ্র্য পীড়িত দেশ হিসেবে ব্যাংক তহবিলের ঋণ ও আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য এই দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল আমরা কতটুকু গ্রহণ করব বা একেবারেই গ্রহণ করব কিনা, করলে তার নীতি, কৌশল, প্রণয়ন পদ্ধতি কি হবে এসবই স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকাশ্য বিতর্কের মধ্য দিয়ে স্থির করতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যদি সত্যিকার অর্থেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে তবে জনগণ ও জাতীয় স্বার্থ বিষয়ক অর্থনীতির এই মূল বিষয়সমূহকে তার রাজনৈতিক এজেন্ডা করতে হবে। কেবল তার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক দলগুলো জাতির প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

এই বিশেষ ক্রোড়পত্রটি সাপ্তাহিক ২০০০ ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর একটি যৌথ উদ্যোগ